Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-IV, April 2019, Page No. 32-44
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http: //www.thecho.in

অমিয়ভূষণের ছোট গল্পের জীবন ভাষ্য

অর্জুনচন্দ্র দেবনাথ
নবীনচন্দ্র মহাবিদ্যালয়, বদরপুর, করিমগঞ্জ, আসাম

Abstract

Amiyobhushan Mazumder (1918-2001) talking about his own short story "Lal Nakshatra", (Ashwin-1393 Bengali Year) in a newspaper interview– "Actually I believe outside colonialists and consumerists Calcutta from Medinipur to Birbhum, Purulia to Nadia Border, North Ulubari to Sikkim Border the land in real sense which is called hinterland, where akin to black bear the black farmer in planty prepares rice for colonialist city, keep the supply of dearness allowance of so called labourers, the land where indigo revolution, farmer mutiny, saotal mutiny, the land where Bankimchandra based his Sanyashi mutiny, the land which is far higher than Calcutta, where seven out of every ten Bengali live, that land is one motherland. It may be Bakkhali, Shukna or village of Ayadhya mountain, without separating from Calcutta, want to tell Calcutta, come out from English influence, see your motherland, love it, you will not die you are sikking in mud, cannot breath in smoke, how long will wear Anglo-Saxon musk". From this feeling of change, I want to put real life truth from Amiyobhushan's story in my essay.

শিল্পের জগতে রূপের আবির্ভাব ভাবনার পশ্চাৎপটে। যুগে যুগে জীবনবোধের বিবর্তন চলছে, জীবনের পরিচয় নিয়ে নিত্য-নতুন অনুভব মানব-শিল্পীর মনে নব নব ভাবনাকে দোলায়িত করে। জীবনকে নতুন করে জানার সেই আনন্দঘন মুহূর্তটাকে নতুনভাবে তুলে ধরার চেষ্টাতেই শিল্প সাহিত্যে নতুন রূপকল্পের সৃষ্টি। ভাবনার প্রয়োজন থেকেই রূপের জন্ম। অতএব, জীবন চিন্তার একটি বিশেষ রূপ যতক্ষণ শিল্পীর চেতনার ফলকে পূর্ণাঙ্গ হয়ে না উঠছে, ততক্ষণ তার উপযোগী নতুন অবয়বের কাঠামোও সুগঠিত হতে পারে না। এই দিক থেকে ছোটগল্পের রূপাঙ্গিক আধুনিকতম জীবন চিন্তারই ফসল।

ছোটগল্পের রূপাঙ্গিক গঠনের জন্য সমালোচকরা 'Totality'-র ধারণাকে বিশেষ মূল্যবান মনে করেছেন। তাঁরা মনে করেন 'Totality' হচ্ছে রচনার সেই অবিভাজ্য শক্তি, যা দিয়ে শিল্পী তাঁর পাঠকের আত্মাকে পুরোপুরি নিজের অধিকারে ধরে রাখতে পারেন। সেই শক্তি দিয়ে ছোট গল্পকার নিজ রচনার মধ্যে তার ইচ্ছাকে পূর্ণতম প্রতিফলিত করতে পারেন। এইজন্য ভূদেব চৌধুরী দুই রকমের ছোটগল্পের স্বভাবগত উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন— "(১) গল্পের আধারে শিল্পীর প্রাণের যথেচ্ছ আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ বিম্বিত করা, (২) গল্প গড়ার সময়ে পাঠকের মনকে সেই আকাঙ্ক্ষার গভীরে একান্ত করে ধরে রাখা।"[১] ফলে স্রষ্ঠার মনোজগতের বাস্তব রূপায়ণ ও আস্বাদনেই ছোটগল্পের চূড়ান্ত রস সিদ্ধি। এরফলে সেই

প্রচেষ্টায় বস্তুগত জীবন প্রচ্ছদ শিল্পীর হাতে এক শ্রেষ্ঠ উপাদান হয়ে দেখা দেয়। এ সম্পর্কে ভূদেব চৌধুরীর মন্তব্য— "ছোট গল্পকারের অনুভব সীমায় ধরা পড়ে আছে সমকালীন জীবনের পুরো পরিচয়টি, যেন মৃৎশিল্পীর হাতের কাছে স্তূপাকারে পড়ে থাকা একথাল মাটি। শিল্পী হাত ভরে ঠিক ততটুকু মাটি তুলে নেন দু'হাত দিয়ে যেটুকুকে নেড়ে চেড়ে পুরো সুখ। মৃৎশিল্পী যত কম মাটি দিয়ে তাঁর মনের মূর্তিকে সংক্ষিপ্ত, অথচ স্পষ্টতম রূপ দিতে পারেন, ছোটগল্পে জীবনের ঠিক ততখানি ব্যবহারই করে থাকেন গল্পকার।"[২] সুতরাং গল্পকারের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্যের দ্বারা ছোটগল্পে জীবন উপাদানের ব্যবহার একান্ত নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। আর এখানেই ছোটগল্পের একাভিমুখিনতার কেন্দ্র মূল।

তবে একথা, সকলকেই মানতে হবে সে, জীবন বর্ণনার ক্ষেত্রেই ছোটগল্পের নাটকীয় স্বভাবের বিকাশ। প্রতীচ্য ছোটগল্প রসিকরা মনে করেন জীবনের বস্তুরূপের সঙ্গে ছোটগল্পের মতোই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ উপান্যাস আর নাটক, এই দুয়েরই। কিন্তু জীবন রূপায়ণে উপন্যাস বিস্তার ধর্মী। সে ক্ষেত্রে নাটকের একমাত্র প্রয়াস সংসক্তি। জীবনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকে সংঘাতের তীব্রতম কেন্দ্র বিন্দুতে সংহত করার দিকেই নাটকের প্রধান সংসক্তি। জীবনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপকে সংঘাতের তীব্রতম কেন্দ্রবিন্দুতে সংহত করার দিকেই নাটকের প্রধান ঝোঁক। ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি জীবনকে বিন্দুবদ্ধ, তথা একটি মাত্রা কেন্দ্রে সুস্থির করে তোলা এবং সেই অবিচল স্থিরতার অতলে ডুব দিয়ে অনন্ত জীবনের স্বাদ আহরণ করাই তার শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা। আর এই কারণেই ছোটগল্পের জীবন বর্ণনা উপন্যাসের ব্যাপ্তির পথ পরিহার করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'পোষ্ট মাস্টার' গল্পের শরীরের, বিশেষ করে শেষ ছত্র কয়টির ভাব-ব্যঞ্জনার মধ্যেই একথার উত্তর পেয়ে যাই আমরা— "একটি গ্রাম্য বালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্ম ব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল।"[৩] রতনের অনিবর্চনীয় মর্মবেদনার গভীরে মানব জীবন স্বভাবের এই ট্র্যাজিক রূপ বিম্বন সম্ভব হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নিভৃত একক অনুভূতির আলোক প্রতিফলনে- তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু শিল্পীর সংবেদনশীলতার সেই আলো রতনের জীবনরেই নানা ক্ষুদ্র খণ্ড মুহূর্তের ওপরে বিচ্ছুরিত হয়ে তারই ভেতর থেকে সর্বকালীন জীবনের রস আহরণ করে নিয়েছে।

আসলে মাতৃ-পিতৃহারা ও নিরন্ন দারিদ্র্য ছাড়াও রিক্ততা মানুষের জীবনে যে রয়েছে আর সেই রিক্ততা আপাত সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মায়া-পথ বেয়ে এসে জীবনকে আমূল দুঃখের অতলে গ্রাস করে নেয়, প্রাণ ধর্মের শিল্পী রবীন্দ্রনাথের এই উপলব্ধিটুকুই ব্যঞ্জিত হয়েছে রতনের জীবন পরিণামে। গল্প যদি তার দুর্দশা ও করুণতার প্রতি হতাশ্বাস রচনা করেই নিঃশোষিত হত, তাহলে একটি ভালো গল্প হলেও ছোটোগল্প তা হতে পারত না। একটি বিশেষ জীবনের বিশেষ মুহূর্তের সুখ দুঃখের রূপ-রচনা ছোটগল্পের উদ্দেশ্য নয়, একটি জীবনের এক মুহূর্তের অতলস্পর্শতার মধ্যে পূর্ণ জীবন ধর্মের একটি অখণ্ড ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে এই শিল্পাঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্য, আর আমরা দেখি রতনের অনিবর্চনীয় যন্ত্রণার বৃন্তে মানব জীবনের স্বভাব ট্রাজেডি কুসুমায়িত ব্যঞ্জনা পেয়েছে। আর এই কারণে রতনের গল্প সার্থক ছোট গল্প। জীবনের এই পূর্ণতা বা সমগ্রতার ব্যঞ্জনার দিকে লক্ষ্য রেখে ভূদেব চৌধুরী ছোটগল্পের তিনটি উপাদানের কথা বলেছেন—

> *"(১) অপার বিস্তৃত রহস্য জটিল আধুনিক জীবন ভূমি, যার প্রতি মুহূর্তে প্রতি বিন্দুতে জমে আছে, অতলান্ত রহস্য গভীরতা, তার যে কোনো একটি বিন্দুর গহনে তলিয়ে পূর্ণ জীবনের একটি অখণ্ড ছায়ারূপকে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে।*

(২) ছোটগল্পের শিল্পী ব্যক্তির ঘন নিবিড় অনুভব তন্ময়তা চলমান জীবন সম্বন্ধে তাঁর ধ্যানিজনোচিত- আত্মস্থতা। সেই সুস্থির চেতনার মুকুরে জীবনের যে কোনও মুহূর্ত যেন পূর্ণ জীবনের ছায়া ফেলতে পারে।

(৩) চাই রচনার ব্যঞ্জনা-ধর্মিতা। যেন একটি জীবনের বিশেষ মুহূর্তের অবস্থান, অভিঘাত, বা আবেগ সর্ব দেশকালের জীবন ভূমিতে উৎক্রমণ করতে পারে।"[৪] *অতএব সীমায়িত জীবনের ক্ষণ-বৃন্তে অনন্ত জীবনের ব্যঞ্জনা রচনাতেই ছোটগল্পের রূপ শৈলীর বিশিষ্টতা।*

আসলে যে কোনো কিছুকে নিয়েই ছোটগল্প লেখা যেতে পারে, জগতের সব কিছুই ছোটগল্পের বিষয়। আর সব কিছুরই ছোটগল্প হয়ে উঠতে পারার পক্ষে একমাত্র অপরিহার্য উপাদান হল স্রষ্ঠার তীব্র ইচ্ছার একক শক্তি প্রেরণা। জীবনের ধারাস্রোতের পাশে পাশে ছোটগল্পের উপাদান ভেসে বেড়ায়, স্রষ্ঠাকে তাঁর চৈতন্যের আ-মূলে ধরে তুলতে হবে এদের যে কোনো একটিকে। শিল্পীর চেতনা ও অবধারণার আলোক ফলকেই বহমান জীবন ধারা মুহূর্তের জন্য ছোটগল্পের রূপ ধারণ করে। দান্তে ও বোকাচ্চিও-এর যুগ থেকেই নিজের স্বয়ং সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে মানুষের প্রত্যয় অবিচল হয়েছে। তার পরে, মনের ভেতরে এবং বাইরে, সেই সম্পূর্ণ মানুষের সত্য কত অতৃপ্তি, সু-তপ্ত দুঃখে-বহনের কী অন্তহীন মন্থন। আর এর মধ্যে অন্তে প্রসৃত জীবনের রূপকে একটি মুহূর্তের গভীর অতলে একান্ত করে বিম্বিত-সীমাব্যঞ্জিত করে ছোটগল্প। ফলে ছোটগল্পের রূপাবয়বের প্রতি লক্ষ্য করে একালের গল্প-শিল্পী অনায়াসে বলতে পারেন—

'সীমার মাঝে অসীম তুমি,
বাজাও আপন সুর।
তোমার মধ্যে আমার প্রকাশ,
তাই এত মধুর।'

বাংলা সাহিত্যের এক বহুপ্রজ বিভ্রান্তির মধ্যে অমিয়ভূষণ মজুমদারের আবির্ভাব এক অলস ব্যতিক্রমে উজ্জ্বল। কিন্তু ঐতিহ্য বিচ্যুত নয়। বাংলা কথা সাহিত্যের গভীরে নেপথ্যচারী হলেও জীবনধর্মী শিল্প সচেতন ধারা বহমান, অমিয়ভূষণ সেই ধারারই একনিষ্ঠ সাধক। সমগ্র মানব সমাজকে তার যাবতীয় টানাপোড়েন সহ তিনি তুলে ধরেছেন প্রখর আত্মজিজ্ঞাসায়। এই জন্য তাঁকে নির্মাণ করতে হয়েছে কথকতার এক বিশেষ ভঙ্গিমা, একই সঙ্গে দৃশ্য ও শ্রবণ নির্ভর। তাঁকে ঘটাতে হয়েছে অভিনব জীবন জিজ্ঞাসার উন্মোচন। তবে ঔপন্যাসিক অমিয়ভূষণ মজুমদার, নাকি গল্পকার অমিয়ভূষণ মজুমদার কোন অভিধা তাঁকে মানায় ভাবতে গেলে একজন মনস্ক পাঠক দ্বিধায় পড়বেন। তবে একথা সত্যি অমিয়ভূষণের সঙ্গে উপন্যাস যেন মিলেমিশে গেছে। তাঁর অবয়ব, বাচনভঙ্গি, হাতের মুদ্রা ইত্যাদি তাকে ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিত্ব এনে দিয়েছে। ছোটগল্পের মৃদুতা ও তীক্ষ্ণতা সেইভাবে ফুটে ওঠে না। তবু শতাধিক গল্প তিনি রচনা করেছেন। একাধিক গল্পগ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকায় অগ্রন্থিত গল্পগুলি প্রমাণ করে তিনি গল্পকারও। কিন্তু কেমন গল্পকার তিনি? ছোটগল্পের প্রচলিত বা প্রথালালিত ধারণা তাঁর কাছে মূল্যহীন, বড়জোর রাবীন্দ্রিক ভাবনাকে তিনি সমর্থন করেন—

'অন্তরে অতৃপ্তি রবে
সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ',

তবে এই অতৃপ্তি ও অশেষ বোধে রবীন্দ্রনাথের যে শিল্প চেতনা, অমিয়ভূষণ ঠিক তার পক্ষপাতী নন। আবার ছোটগল্প, বড় গল্প এমনতর ধারণার তিনি সমর্থক নন। এজন্য গল্পকার অপেক্ষা তাকে 'গল্প কথক' বলাই ভালো। তাই স্বভাবতই তাঁর গল্পে পাঠকদের 'সব পেয়েছির দেশে' পৌঁছানোর পথ দেখাতে সমর্থ হননি অমিয়ভূষণ, কিংবা সাহিত্য করে অর্থ উপার্জনের মনোরঞ্জনী রাস্তায় তাকে দাঁড় করাতে পারে নি। পরিবর্তে তিনি প্রথমাবধিই হয়ে উঠেছেন জীবনের সতত অনুসন্ধানী এক স্বকীয়, পরিশীলিত সাহিত্যিক।

উল্লেখ্য যে, অমিয়ভূষণের গল্পের আলোচনার শুরুতেই আগে তাঁর 'নিজের কথা'র কিছু জেনে নেওয়া যাক্-- "আসলে আমার বিশ্বাস কলকাতা নামক ঔপনিবেশিক শহর ও কনজুমার গুডসের আড়তের বাইরে মেদিনীপুর থেকে বীরভূম, পুরুলিয়া থেকে নদীয়া সীমান্ত, উলুবেড়ের উত্তর থেকে সিকিম সীমান্ত ছড়ানো কলকাতার বাইরে যে ভূমি... যাকে প্রকৃতপক্ষে hinter land ভাবা হয়। সেখানে দলে দলে কাদায় পা পুঁতে দাঁড়িয়ে ভালুক চেহারার কালো কালো কৃষকেরা ঔপনিবেশিক শহরের অন্ন তৈরী করে। তথাকথিত শ্রমিকদের ডিয়ারনেস অ্যালাওন্সের যোগান ঠিক রাখে, যে ভূমিতে নীল বিদ্রোহ, চাষী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, যে ভূমিতে বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অবস্থান পাতেন, সেই ভূমি যা কলকাতার চাইতে অনেক বড়, যেখানে বাঙালিদের দশভাগের সাতভাগ থাকে, সেই আমাদের মাতৃভূমি। তা বকখালি হোক, শুকনা হোক কিংবা অযোধ্যা পাহাড়ের গাঁ। কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাচ্ছি না, কলকাতাকেই বলতে চাইছে বেরিয়ে এসো ইংরেজিয়ানা থেকে, দেখো এই মাতৃভূমি, ভালোবাসো একে, মরবে না। কাদায় ডুবে যাচ্ছ, ধোঁয়ায় দম বন্ধ, কতদিন আর অ্যাংলো স্যাকসনি মুখোসে থাকবে।"[৫]

অমিয়ভূষণের বক্তব্যে কিছুটা উত্তেজনার ঝাঁজ আছে সত্য, কিন্তু জীবন সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির এক স্পষ্ট প্রত্যক্ষতা উচ্চারিত। আর এই জীবনবোধ থেকেই তাঁর লেখায় উঠে এসেছে, আরাবানিটি বর্জিত বাংলাদেশ ও উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি এবং তৎসংলগ্ন কিছু মানুষ। সেই সব মাটিঘেঁষা মানুষগুলিকে ফুটিয়ে তোলার লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়েছে আঞ্চলিক ভাষার এক বিশেষ নির্মিত। এ প্রসঙ্গে ছোটগল্প ও তার ভাষা সম্পর্কে অমিয়ভূষণের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য— "ছোটগল্পের মূল সূত্র এটাই এটা কবিতার মতো জিনিস, এখানে আপনার মন আমি অন্যদিকে যেতে দেবো না, আপনি যখন নৌকাতে চড়েছেন, তখন নৌকাতেই আপনাকে নিয়ে যাবে, মাঝপথে স্টীমারে উঠতে দেবো না।... ছোটগল্পের ভাষা তাই হবে totally in conformity with the total composition of piece."[৬]।

ছোটগল্পকার অমিয়ভূষণকে নিয়ে পাঠক সমালোচকদের বহু সমস্যা। কেন না, তিনি ছোটগল্পের খাঁচায় বন্দি হতে চান না, গল্প বলাই তার উদ্দেশ্য। ফলে, তাঁর লেখায় বর্ণনা বাহুল্য আছে, বাগ বিস্তার আছে। গল্পের ঘটনা ও চরিত্রকে নিয়ে তিনি নানা দিক থেকে বাজিয়ে দেখতে দেখাতে চান। তাইতো সাক্ষাৎকারে তিনি বলতে পারেন— "ছোটগল্প ছোট হতে হবে এই কথাটিই আমি মানি না। আমার একটি গল্প লিখতে গল্প তৈরি হতে যতটা জায়গা নেয়, ততক্ষণ চলবে, তার মাপ কি হবে, সে নির্ভর করবে তার থিম, আমার কল্পনা- এসবের ওপরে। আমি এরকমই লিখি।"[৭] এজন্যই তাঁর ছোটগল্পগুলি পড়তে গেলে মনে হয় 'বর্ণনার ছটা' থেকে তিনি এড়িয়ে যেতে চান না। কিংবা পারেন না। তাইতো সমালোচক অরুণ মুখোপাধ্যায় মনে করে— "অনেক সময় তাঁর গল্প অর্জুনের দেখা পাখির চোখ না হয়ে গাছ ও পাখিকে ধরে দেয়।... লেখকের সঙ্গে কথক এসে হাত মেলায়। কিছুটা সর্বজ্ঞর ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেন।"[৮] আসলে মনোরঞ্জনে তিনি আগ্রহী নন কিন্তু পাঠক আনুকূল্যই তাঁর লক্ষ্য। তাই তো তিনি জীবন মশায়ের গল্প লিখতে চান— "ভালয় মন্দয়, বাস্তবে কল্পনায় মিশানো একটি গল্প, তার বেশি নয়। ...কোনটা জমে,

কোনটা শেষ পর্যন্ত একটা ফ্যাকাশে ঠাট্টাই হয়। কিন্তু যাই হোক, গল্পটা হারালে জীবন মশায়েরও পাত্তা থাকে না।"[৯]

গল্পকার অমিয়ভূষণ আমাদের মনে করিয়ে দেন, ছোটগল্প শব্দ দিয়ে লেখা হয়, প্রসঙ্গ দিয়ে নয়। যাঁরা শব্দের পর অনর্গল শব্দ ব্যবহার করেন, অবিরাম বাক্যের পর বাক্য গেঁথে যান— তিনি তাদের থেকে দূরের মানুষ। প্রাত্যাহিক জীবনে যেসব কথায় আমাদের লেনদেন চলছে, সংবাদপত্র কমলে কামিনীর মতো নিত্য যে ভাষা খেয়ে উগরে দিচ্ছে, সে ভাষায় তাঁর তৃষ্ণা নেই, বাংলা লেখায় সাংবাদিকতার ক্ষতিকর অভিঘাত এসে লাগছে এই প্রসঙ্গে তিনি বিশেষভাবে ভাবিত। ছোটগল্প এমন কিছু নয়, যা সংবাদপত্রের অফিসের কাজ করলে লেখা যায়। সাহসী উচ্চারিত শিরোনামার মতো ছোটগল্পের বিষয় হাতুড়ি মেড়ে পাঠকের মাথায় ঢুকিয়ে দেওয়াকে তিনি আন্তরিক ঘৃণা করে। তাঁর এই প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক তাঁর এই বিরূপতা সঙ্গত।

অমিয়ভূষণের ছোটগল্প আলোচনার অনেকটাই তাঁর নিয়মিত আলোচনা, তাঁর বিচার এবং বিশ্লেষণ। ছোটগল্প তাঁর কাছে সেই কবিতা যা গদ্যে লেখা হয়। এবং একই সঙ্গে ছোটগল্প তাঁর কাছে প্রবন্ধ যা বেশ কঠিন করে বাঁধার জিনিস। আরো অনেকের মতে শ্লথ শিথিল কথার অপরিপাটি অনান্দনিক জাল উদ্দেশ্যহীন ভাবে বুনে চলা কখনো তাঁর উদ্দেশ্য নয়, তার শ্রেষ্ঠ সময়, সুযোগ এবং চেতনা নিয়ে বাংলা গদ্যকে তিনি তাৎপর্যে মণ্ডিত করে তোলার কাজে লেগেছেন। তাঁর সমূহ গল্প একটি কল্পনা কুশল মননশীল ব্যক্তিত্বের বিচ্ছুরণ, তাঁর সমস্ত গল্পে এক সচেতন সংবেদনশীল সত্তার পরিচয় বিকীর্ণ। সামাজিক বস্তু হিসেবে ভাষার দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁর নাগরিক চেতনা তো আছেই, অধিকন্তু ছোটগল্প তো একটি শিল্প পরিণতি, তাই সংস্কৃতিকর্মী রূপে তাঁর স্বআরোপিত ভূমিকা আরো বেশি লক্ষ্য করার বিষয়। এই বোধ তাঁর সর্বতোভদ্র জীবন চেতনার এক অংশ। তাই সমালোচক বীতশোক ভট্টাচার্য মনে করেন— "এক পান্তর মেরুদণ্ডহীন সমাজে কশেরুকাটান গদ্যের অতি ঋজু সঞ্চরণের আলাদা প্রত্যয় ও আনন্দ আছে— তাঁর লেখা একথা মনে করিয়ে দিতে চায়।"[১০]

অমিয়ভূষণ মজুমদারের লেখা ছোটগল্পের সংখ্যা খুব বেশি নয়। পাঁচটি মাত্র গল্প সংকলন প্রকাশিত হয়েছে আজ পর্যন্ত। 'পঞ্চকন্যা' (১৯৬২), 'দীপিতারঘরে রাত্রি' (১৯৬৫), 'শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৮৬), 'গল্প সমগ্র' (১৪০১), 'ম্যাকডাফ সাহেব ও অন্যান্য গল্প' (২০০০), এই পাঁচটি গল্প গ্রন্থে পঞ্চাশটির মতো গল্প আছে। এছাড়া সারা জীবনে লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা আরো সত্তরটির মতো গল্পের সন্ধান মেলে। অধিকাংশ গল্প সাপ্তাহিক, মাসিক-পত্রিকা থেকে উদ্ধার করাও কষ্টকর। এমনকি প্রকাশিত পাঁচটি গল্প সংকলন সংগ্রহ করাও বেশ কঠিন ব্যাপার। ফলে অমিয়ভূষণের গল্প নিয়ে আলোচনায় কিছুটা অসম্পূর্ণ থাকা স্বাভাবিক। অমিয়ভূষণের গল্পে বৈচিত্র্যের কথা আগে বলেছি। কিন্তু এই পর্যন্ত যে কটি গল্প পড়েছি তার মধ্যে অধিকাংশ গল্পেই ফর্মের দিক থেকে চমকপ্রদ হলেও তাতে দেখেছি ধুয়োর মতো বারবার ফিরে এসেছে সেই অনন্ত জীবন জিজ্ঞাসা। ফলে জীবনবোধের অগতানুগতিক গভীরতা ও ব্যাপ্তিই অমিয়ভূষণের গল্পের অসামান্যতার কারণ, তাঁর 'নির্বাস' উপন্যাসের সূচনাংশ থেকে এই 'অনন্ত জীবন জিজ্ঞাসার' পরিচয় পেতে পারি আমরা—

> *"গল্পটা না বলে উপায় নেই। কারণ চেতনায় অন্য কারো জীবনের ছায়া যদি মুহূর্তের জন্যও পড়ে তবে সে বাইরের বিষয় থেকে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র উপায়ই হচ্ছে ছায়াটাকে বিশ্লেষণ করে*

দেখা, তা নিয়ে আলোচনা করা, অন্য কথায় গল্পটা বলে ফেলা। আমাদের চেতনা শুক্তির মতো কেন ছায়াটিকে আত্মস্থ করার চেষ্টায় মুক্তা তৈরি করে না তা অন্য কথা।...

কথা, কথা। গল্প কি বলা যায়? এখানে প্রতিটি শব্দই একটি খন্ড প্রত্যয়কে ধরে আছে। প্রত্যয়ের নামরূপ কথা, প্রতিটি প্রত্যয়ই দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধের বাঁধনে বাঁধা। এদিয়ে মানুষের দেহটাকে গড়ে তোলা যায়, তাকে সচেতন করা যায় না। বুদ্ধির সাধ্য কি তার এই কথার ইটে জীবনবেগ গড়ে তোলে?"[১১]

সাহিত্যের পাঠক সাধারণত দু'ধরনের হয়। এক ধরনের পাঠক খোঁজে জীবন সত্য, অর্থাৎ কী পেলাম, এ গল্প কি বার্তা বহন করে এনেছে। যদি কোনো নির্দিষ্ট বার্তা না পায় তাহলে সে একে মেকি, অবিশ্বাস্য, এক সুন্দর মিথ্যা বলে চিনে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে নেবে। আবার এমন একদল পাঠক আছে যারা এই অনির্দিষ্ট, অনির্ণেয় গল্প বা আখ্যানের কাছে স্তব্ধ হয়ে শ্রদ্ধা জানায়, খোঁজে না এর সত্য-মিথ্যা, জানতে চায় না জীবনের আর গল্পের অনুপাত। হ্যাঁ, এমন পাঠকদের জন্যই অমিয়ভূষণের গল্পগুলি জীবন্ত, বেগবান হয়ে নিজের কক্ষপথে বিচরণ করে চলেছে। মেধা ওমনন, স্মৃতি ও বিস্মৃতি, জ্ঞান ও নির্জ্ঞানের হাত ধরে তার কাছে যেতে হয় নিজের তাগিদে-নিজের 'পিতৃভূমির খোঁজে'। 'উরুন্ডী' গল্পের পুলিন ঠিক এ কথায় বলেছিল শোভাকে- "ফারাও ছিলো মিশরের রাজা, তার অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য একদল লোক বেরিয়ে পড়েছিল, পিতৃভূমির খোঁজে। তাকে এক্সোডাস বলা হয়ে থাকে।"[১২]

জীবনে ব্যর্থতা বঞ্চনার শেষ নেই, তবু মানুষ সার্থকতার সন্ধানে এগিয়ে চলে। বস্তুত অমিয়ভূষণের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির বিষয় যেন এই নিরন্তর সন্ধান ও যাত্রা। 'উরুন্ডী' গল্পের পুলিনের। হাঁস হয়ে উড়ে এসেছিল ওপারের পৃথিবী থেকে- 'ভেঙে-চুরে ছিঁড়ে নতুন কিছু করা যায় কি না' এই প্রত্যাশায় তারা উরুন্ডীতেই পাখা গুটিয়ে বসে পড়ে, বাহান্নজনের দলে এখন বাইশ জন আছে। এক কল্পিত পিতৃভূমির সন্ধান করছে তারা, ময়লা, খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে পুরুষেরা এবং চুলে জটা আর গায়ের গন্ধ নিয়ে মেয়েরা চলছে উরুন্ডীতে বাসা বাঁধার লক্ষ্যে। উত্তরের লাল নীল ত্রিভূজের মতো পাহাড় কিংবা পশ্চিমের গাঢ় নীল ফরেস্টের মাঝখানে উরুন্ডী আজ দৃশ্যমান না হলেও সবসময় আড়ালে থাকতে পারে না। এই জোরেই কেউ একজন এসে দাঁড়ায়। শোভা। শরীরের ক্লান্তি আর মলিনতা নিয়ে উদ্বাস্তু এই দলটি যখন বিপর্যস্ত তখন শোভাই তাদের দলনেতা পুলিনকে সাহস, ক্লান্তি ও দুর্বলতা থেকে রক্ষা করে চলার শক্তি সঞ্চার করে দিতে পেরেছিল। নিজের শরীরের পৃথিবীটা পুলিনকে অধিকার করতে দিয়ে তাকে সঞ্চারিত করে তাকে অনুপ্রেরণার মন্ত্র দিয়েছিল শোভা। সেখানে আশ্রয় পেয়ে পুলিন এবং তার অধীন সমস্ত দলটাই আবার চলতে পারে, যার প্রেরণার উদ্বাস্তু মানুষগুলো নিজের মাথায় ঘাম মাটিতে ফেলে স্থিতধী হবার প্রয়াস পেয়েছে। পেতে চেয়েছে জীবনের স্থায়ী ঠিকানার সন্ধান, যার মর্মমূলে রয়েছে একদিকে বাইশজন উদ্বাস্তু মানুষ, অন্যদিকে শোভার নারী সত্তা, উভয় দিকেই আছে জীবন বোধের এক অনন্য তৃষ্ণা, কিংবা বলা যায় নতুন সঞ্চারের আর এক প্রয়াস। তাইতো অমিয়ভূষণ বলতে পারেন- "জীবন ছাড়া একদণ্ড চলার উপায় নেই, উপন্যাস দূরে থাক, একটা ছোটগল্পও চলে না।"[১৩]

ইংরেজদের মিথ অনুযায়ী 'অ্যাভলন' হলো এমন এক স্বপ্নের দ্বীপ যেখানে কিং আর্থারকে হোগ, গ্রেস প্রভৃতিরা নিয়ে গিয়েছিল। তা ছিল আশার দ্বীপ। সেই শান্তির দ্বীপে মানুষের আশ্রয়ের শান্তি পাওয়া যায়। এই মিথকে প্রতীক করে অমিয়ভূষণের সাংকেতিক গল্প 'অ্যাভলনের সবাই'। যুদ্ধ পরবর্তী ইউরোপের বাস্তুহারা

এমন একদল মানুষের গল্প যারা অস্থির হয়ে দীর্ঘকাল পথ অতিক্রম করে শান্তির দ্বীপে পুনর্বাসন পেতে চায়। এই দলটিকে নেতৃত্বে দিয়ে পথ দেখিয়ে আনেন সেন্ট সাইমন। কিন্তু এই বাস্তুহারা মানুষগুলির জীবনে হঠাৎ করে একদিন বঞ্চনার কালো মেঘ ভরাট হয়ে এসেছিল, পথ চলতে চলতে তাদের থেমে যাওয়া ও ছিল তখন স্বাভাবিক। তখন ক্লান্ত, পথহারা সেই দলপতিকে ভরসা, আশা এবং জীবনে চলার মন্ত্র জুগিয়েছে আর একটি ক্লান্ত জীবন নিনা। দুটি জীবনের বলা চলে শরীরের সংঘর্ষে যে আলো জ্বলে উঠেছে সেই আলোই তো বাস্তুহারা দলটি অন্ধকার মাড়িয়ে কাঁটা তারের বেড়াকে ডিঙিয়ে যাবার শক্তি সঞ্চয় করে। কেন না তাদের তো আরও অনেক পথ যেতে হবে। যা কঠিন, দুর্গম, কিন্তু সবই সম্ভব প্রাণশক্তির প্রেরণায়, তাইতো লেখকের কথায়- "স্বাভাবিকভাবেই কাঁটাতারের রেড়ার কাছাকাছি যেখানে বড়ো বড়ো ঘাস কিংবা অন্য ঝোপ ঝাড়ের আড়াল আছে, সীমান্ত পার হওয়ার জন্য সে জায়গাগুলোকেই বেঁচে নেওয়া হয়, খরগোষের মতোই তারা নিঃশব্দ দ্রুততায় সীমান্ত পার হতে চেষ্টা করে। কিন্তু কখনো দেখা যায় বর্ডার আউটপোস্টের রাইফেল থেকে একটা নগন্য শব্দ দেখা খানিকটা ধাঁরা, যা মিলিয়ে গেলে কাটা তারের বেড়ার কাছে ঘাসগুলোর মধ্যে মুমূর্ষু খরগোষেচর মতোই একটা মানুষ উল্টে পাল্টে আকুঞ্চিত হতে থাকে। অনেক সময়েই অবশ্য আউট পোস্টকে ফাঁকি দেয়াও সম্ভব হয়।"[১৪]

'অ্যাভলনের সরাই, গল্পের ইহুদি ছিন্নমূলের দল স্বপ্ন দেখে, কোথাও না কোথাও তারা কাঙ্খিত সরাইটা পেয়ে যাবে, তাদের নিতে আসবে ট্রেন, সাতদিন ধরে প্রাচীন, উপত্যকা পার হতে হতে, পাথরের গুড়ো মেখে মেখে সে স্বপ্নকে ওই পরিত্যক্ত স্টেশনেই ফেলে যেতে বাধা হয়। চারদিকের নেড়া পাহাড়, পাহাড়ের গায়ে যুদ্ধের দগদগে ঘা-র মতো ডিনামাইটের ক্ষত চিহ্ন, আর ওপর তুষারপাত এসব পার হয়ে তারা পৌঁছায় গভীর খাদের কিনারে, ওপারে যাবার একমাত্র উপায় দড়ি ধরে চলা। সাইমন তার পোড়ামুখ ঢাকতে যে পাতলা হলুদ রঙের রবারের মুখোশ পরেছিল, দুর্গম পথে চলতে শুরু করার আগে তা খুলে ফেলে, দেখা যায় তার নাক নেই। আজ শুধু দুটো গর্ত। অনাবৃত, কুৎসি আর ভীষণ সত্যের প্রতীক হয়ে ওঠে সাইমনের নাকের গর্ত। অনিবার্য মৃত্যুকে তবু তালুবন্ধি করে দড়ি ধরে ঝুলে পড়ে সেই সাইমন। অনির্ণেয় এই গল্পের শুরুতে কাঁটাতারের বেড়ার কাছকাছি রক্তাক্ত খরগোষের মতো লুটিয়ে পড়া মানুষের যে ভীবৎস নিষ্ঠুরতা, শেষে যাত্রার বন্ধ্যা পরিণতি দেখে ও সাইমনের দড়ি ধরে ঝুলে পড়া- এই দুই এপার ওপার বিপ্রতীপের সংঘর্ষের মাঝখানে মানব সভ্যতার ইতিহাস বিষয়ক, প্রফেসর ষোশেফের রচনাবলি নিরর্থক প্রমাণিত হয়।

বীভৎস, নিষ্ঠুরতার মধ্যেও বাস্তুহারা দলটি চলছে অ্যাভলনের সবাই-এর উদ্দেশে। কেন না, সেখানে পড়ে রয়েছে তাদের সমস্ত স্বপ্ন, নিশ্চিন্তি, খাদ্য বা নিরাপত্তা। কিন্তু কার্যত তারা কেউই শেষ পর্যন্ত অ্যাভলনের সরাইতে পৌঁছোতে সমর্থ হয়নি হয়তো সম্ভবও হয়নি। আসলে স্বপ্নের কাঙ্খিত লোকে পৌঁছানো যায় না। যুদ্ধ হোক বা না হোক মনের দিক থেকে আমরা সকলেই উদ্বাস্তু, আমাদের স্বপ্নের ভুবন থেকে আমরা উৎখাত হয়ে এক শান্তি স্থিতির লক্ষ্যে চির অভিযাত্রী। পা ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত হচ্ছে। মন বিষণ্ন ও ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছে, তবু আমাদের হাঁটার শেষ নেই। আর এভাবেই গল্পটি হয়ে উঠেছে অনন্ত জীবন জিজ্ঞাসার এক বাণী নির্মিত।

শেকড়ে ফিরতে চাওয়া আর শেকড় ছিঁড়ে চলে যাবার অসহ্য বেদনা আর হাহাকার অমিয়ভূষণের গল্পের এক বড় ধরনের প্রস্থান ভূমি। পুলিন ও সাইমনেরা যখন তাদের জন্মভূমি খুঁজছে তখন 'দুলারহিনদের উপকথা'র দুলারহিন তার ভুখন ভাইয়ের জন্য কেঁদে কেঁদে শেষমেশ শেকড় ছড়িয়ে দেয়ে,

বীজ খসিয়ে দেয় এক ভিন গায়ে- তিন চারটি ছেলেমেয়ে তার। আসলে নারী-পুরুষ জীবনের সমস্ত আয়তনই যেন গড়ে ওঠে পরস্পরের বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণ বিকর্ষণকে কেন্দ্র করে। এক ভিতরে যে গহন রহস্য, জীবন রূপায়ণেরই প্রক্রিয়ায় সমাজ তাকে আচ্ছন্ন রাখে সামাজিক সম্পর্কের পোশাকে। এই পোশাক যখন অভ্যাসের মাধ্যমে দ্বিতীয় স্বভাবের জন্ম দেয়, তখন এই রহস্যের সঙ্গে সংঘাতের মধ্য দিয়ে তৈরি করে দিতে পারে এক নতুন জটিলতা। 'দুলারহিনদের উপকথা' দুটি চরিত্রের সম্বন্ধের সেই জটিলতারই গল্প। লেখক শুরুতেই- "এই যাকে বলেন vision অর্থাৎ জীবনানন্দ প্রস্তাবিত সেই কল্পনা প্রতিভার যথাযথ সম্মিলনে 'তাঁতীবউ' গল্পটি ও তাঁর শ্রেষ্ঠতম মধ্যে একটি। ইতিহাসকে এখানে তিনি একটা আবছা আবহের মতো করে ব্যবহার করলেও এ গল্পের মধ্যে কোনো ঐতিহাসিক সময়ের বাঁধা খাত নেই। পশ্চিমী ইতিহাস বিচারের, আলো-অন্ধকার, যুগ বিভাজনের ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করে 'তাঁতী বউ' গল্পের সময়কে বলা হয়েছে 'আকাঙ্ক্ষাহীন মিলনের যুগ'। মসলিন শিল্পী গোকুল আর ইদিলশাহী পরগনার হাট থেকে কেনা বাঁদির গল্পে, অমিয়ভূষণের অন্বেষণ বা অন্বেষণহীনতা কথকতার সহজ মধ্যযুগীয় চালে এগোয়। অন্যান্য গল্পের মতো দীর্ঘ বাক্য, জটিল অন্বয়, বা ইমেজারির অনন্যতা নয়, এখানে তিনি আশ্চর্য যাদুতে ছোট ছোট বাক্যে, ইমেজারিহীনতা দিয়েও বুনে নিয়েছে মসলিন প্রতিম স্বচ্ছ আর সূক্ষক্ষ আখ্যান।

মনে রাখতে হবে, শিল্পের সূক্ষ্মতা শিল্পীর পরমার্থ। কিন্তু সেই সূক্ষ্মতায় পৌঁছাতে গেলে চাই মনের এক নিরাপদ নোঙর, ভালোবাসার অচল সমুদ্রে জীবন-জাহাজ নোঙর ফেলতে পারলে তবেই তাতে দোলা লাগে। তাই যেদিন বাঁদি হয়ে ওঠে গোকুল তাঁতির বউ, তাঁতী বউ। কিংবা বলা চলে গোকুলের শিল্পীমন আশ্রয় পেয়েছিল ইদিলশাহী হাট থেকে কিনে আনা বাঁদির কাছে, সেদিন তার মনে হয়েছিল- "সকালে তাঁত ঘরে গিয়ে গোকুল প্রথম কিছুক্ষণ এত সূক্ষ্ম কাজ করল যা জীবনে করেনি। মানুষের শরীর যে এত তৃপ্ত হতে পারে কে জানত? শিরা উপশিরাগুলির শূন্যতা পূর্ণ হয়ে সেগুলি এত স্নিগ্ধ হয়েছে যে মনে হচ্ছে শ্বেত চন্দন মাখা গায়ে ভোরের হাওয়া লাগছে... গোকুলের তাঁত ঘর থেকে দিবারাত্রি গান শোনা যায়, যে গান গলা নিরপেক্ষ, সুর নিরপেক্ষ, চাষী হলুদে ধান কাটতে যে গান গায় কতকটা তেমনি।"[২০] এরমধ্যেই গোকুল স্বপ্ন দেখে ফুলের চাইতেও একটি সুন্দর ছেলের, কিন্তু তাঁতী বউ উপলব্ধি করেছিল নিজের সাধ পূরণ করতে গোকুল নিজেই ব্যর্থ। কিন্তু তাবিজ, কবজেও কাজ হয় না, তাই গোকুলের ইচ্ছায় তাঁতীবউকে যেতে হয়েছে গায়ের মাঠে ফকিরের মন্ত্র নিতে। যার মধ্যে লুকিয়ে আছে ধর্ষণের মিতবাচিক বর্ণনা। তবে বাঁদীর এই প্রয়াস তাঁতীর অস্তিত্বের জয়গান ঘোষিত করার জন্য একথা গোকুল মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে নিল অথচ যে এল সে স্বাভাবিক সন্তান নয়, অসুস্থ রুগ্ন, অপুষ্ঠ শিশুটি হাঁটে না, মনে হয় 'যেন কতকালের বুড়ো হাসে না পর্যন্ত।'

পক্ষান্তারে বিষণ্ন গোকুল দেশান্তরী হয়, রুগ্ন, অমুঙ্গলে ছেলেকে বুকে চেপে তাঁতী বউ ওর পথ চেয়ে বসে থাকে। কিন্তু গাজনের মেলা থেকে ফেরার পথে দেবমূর্তির দেবশিশুর মতো ছেলেদের দেখে তার লোভ জাগে, রাজবাড়ির দেবমূর্তি তাকে প্রলোভন দেখায়। ইতিমধ্যে ফিরে আসে অসুস্থ ক্লান্ত গোকুল। ভয়ে ভয়ে বলে- 'আমি কি বাঁচবো না বউ'? তাঁতীর দিনে দিনে ফুরিয়ে আসা সময় দেখে অস্থির হয়ে ওঠে তাঁতী বউ। সে ভাবে- "একটা সুস্থ সবল ছেলে কেন তার কোলে এল না? গাজন তলার হাটে দেখা ছেলেদের মতো একটা পেলে গোকুল হয়তো বাচার জোর পেত। এত নিবিড় করে সে গোকুলকে সুখী করতে চায় তবু কেন পারবে না সে।"[২১] একরাতে অন্ধকারে, মসলিনে সজ্জিত তাঁতীবউ সম্পূর্ণ প্রসাধিত হয়ে 'জ্বলতে জ্বলতে এগিয়ে গেল সেই রাজবাড়ির অন্ধর মহলে, যার কথা শুনলে গ্রামের বৌ-ঝিরা আতঙ্কে কেঁপে উঠে।

লেখকের ভাষায়- "জমিদার বাড়ির বাগান পার হল তাঁতীবউ। গ্রামের বউঝিদের কৌতুহল ও আতঙ্কের গল্প শুনে শুনে সে জানে কোথায় সেই ঘরটি। প্রতিবার পা ফেলতে সারা গায়ের স্নায়ুগুলো রিন রিন করে উঠছে। রুদ্ধ দরজার ফাঁকে, আধ খোলা জানালায় একটু আলো চোখে পড়ল, দরজা ধরে দম দিতে লাগল তাঁতী বউ। তার একবার মনে হয়েছিল কেঁদে ফেলবে সে। একটা অস্ফুট অর্ধজান্তব আকুতি যেন দরজায় করাঘাত করল তার মনের মধ্যে। কি করে দরজ খুলে গেল তাঁতী বউয়ের মনে নেই। প্রবল প্রতিরোধে হৃৎপিণ্ডকে ঠেলে উঠতে না দিয়ে ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াল সে, বর্ষণক্ষান্ত আকাশে ভোরের পাখি ডেকে ওঠার আগে সে ফিরে এল। ঘরে তখনো প্রদীপটা জ্বলছে, যেমন সে জ্বেলে রেখেছিল। ছেলেটি এখনই জেগে উঠবে। তার আগে বিশ্রাম করতে হবে, স্নায়ুগ্রন্থিগুলো অন্তত একটু স্নিগ্ধ করতে হবে। কিন্তু গোকুলের মুখখানি দেখবার লোভ হলো তার। ঘুমটা আজ ভালোই হচ্ছে গোকুলের। কয়েক বিন্দু স্বেদ যেন দেখা দিয়েছে, আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিল তাঁতী বউ। এবার আবার কান্না পাচ্ছে। কিন্তু কাঁদলেও সময় নষ্ট হবে খানিকটা। সকলেরই বিশ্রাম নেবার অধিকার আছে পৃথিবীতে, তারও আছে। মাটিতে শুয়ে দেখতে-দেখতে তাঁতীবউ ঘুমিয়ে পড়ল।"[২২]

কিন্তু প্রশ্ন জাগে- কী দেখছে সে? তার এবং স্বামী গোকুলের অনাগত স্বপ্নের দেবশিশু প্রতিম সর্বাঙ্গ সুন্দর সন্তানকে, যার জন্য সমাজ বেঁধে দেওয়া ধার্যমূল্য তথা নারীর সতীত্বকে সে অস্বীকার করতে পারে। তবে তাঁতী বউয়ের এই দুঃসাহস, সন্তান স্নেহ আর গোকুলের স্বপ্ন পূরণ কোন অর্থের পরাজয় নয়। এখানে আমাদের মনে পড়বে দুলারহিন ও ভাইকে সুখী করতে নিজে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল এক বুড়োর মারফৎ, বুড়োরই ছেলের বউ হয়ে। আসলে 'তাঁতীবউ' নিজেকে বাঁচাতে ছেলে এবং স্বামী গোকুলকে বাঁচানোর জন্যই সব দ্বিধা দ্বন্দ্ব জয় করে জীবনের বিষ্যমৃত পূর্ণ রসধারা পান করেছে। সেই সঙ্গে 'সকলেরই বিশ্রাম নেবার অধিকার আছে পৃথিবীতে, তারও আছে' কথাটিতে মানুষের বাঁচবার জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

আগেও বলেছি, অমিয়ভূষণের বেশির ভাগ ছোটগল্পই শেকড় ছেঁড়ার যন্ত্রণা আর শেকড়ে ফেরার আকুল অভিযাত্রার কথা। 'সাইমিয়া ক্যাসিয়া' তেমনই বড় সময়ের গল্প যেখানে মানুষ তার পুরনো গাছ, ছায়াও শেকড়েই অটল থাকার চরম মূল্য দিতে প্রস্তুত। গোটা সভ্যতার ও সমাজ বিবর্তনের ধারার মধ্যে মানুষের আদি অসহায়তা কীভাবে অনড় ও স্থবির হয় তাকে গ্রাস করে তারও আশ্চর্য নমুনা এ গল্প। তিব্বত-ভারত সীমান্তের কাছাকাছি এক তিব্বতি পরিবারের এই গল্প মূলত- থেনডুপ ও পেমাই মুখ্য; কিন্তু স্মৃতির স্তবক খুলে বারে বারে উঠে আসে দ্বাদশ শতকের অতীশ দীপঙ্কর, ঊনিশ শতকের শরৎদাশ, ধূর্ত পর্যটকবেশী ইংরেজ বাণিজ্য চর লোকনাথ, থেনডুপের পূর্বপুরুষ গিয়াৎসো, ওরিস্পোচে লামা পুরুষানুক্রমে পাহারা দেয় অতীশের স্মৃতিজড়িত গুহামুখ, তিনি এসেছিলেন পরম কারুণিক অমিতাভের বাণী বহন করে। আর চতুর লোকনাথ তাদের কাছে আসে, তাদের দেখে ধনতন্ত্রের জাল বিছাতে, সে ব্যবহার করে বুদ্ধের বাণী, অতীশের ভঙ্গী। সরল, ধর্মপ্রাণ-তিব্বতি মানুষ তাদের ছলনা বোঝেনি, তাকে সাহায্য করার অপরাধে মোঙ্গল ঘাতক, গিয়াৎসোর মুণ্ডচ্ছেদ করে নির্জন পাহাড়ের ঢালে- সেখানে জেগে উঠেছে সাইমিয়া ক্যাসিয়ার গোলাপী ফুলগুলি। লেখকের ভাষায়- "থলো থলো গোলাপী ফুলের মধ্যে কখনো কখনো নাকি দুটো ডালে সোনালী ফুল ফুটে।"[২৩] আর এখানেই গল্পের অন্তরনিহিত মর্মবাণী ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

'শক্ত সাদা পাথরে' পা ডুবিয়ে রঙিন সাইমিয়া ক্যাসিয়া মনে করায় 'রক্তকরবী' নাটকের নন্দিনীর সেই ফুল, আর পেমার ক্যাসিয়া সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই মাত্রায় গ্রথিত হলে ও একজায়গায় তাদের আশ্চর্য মিল-

জীবনের প্রাণ প্রাচুর্যে তারা পাথর, পাঁচিল ফাটিয়ে জেলে থাকতে পারে। পেমা এই ফুলের মতো সুন্দর, নির্জন আর 'লড়াইবাজ।' সে বিশ্বাস করত হানরা এলে পরিবর্তন আসতে পারে। হান মেজরের মতো একটা সুন্দর ছেলে হলে পাল্টে যেতে পারে তাদের জীবন যাপন, থেনডুপের প্রতি একনিষ্ঠতায় সে দীর্ঘ পঁচিশ বছর অন্য কোনও পুরুষকে তার কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। অশক্ত থেনডুপকে মায়ের মতো মমতায় জড়িয়ে ধরে তার দেশসেবার আদর্শকে নিজের বুকে লালন পালন করে বাঁচতে চেয়েছে। থেনডুপের আশ্রয়ের ভূমি হয়ে উঠতে চেয়েছে, যে থেনডুপকে- "সাড়ে তিনফুট উচুঁ, পাঁচফুট লম্বা, তিন ফুট চওড়া এক অন্ধকার ঘরে যাকে পঁচিশ বছর কাটাতে হয়েছে, সেকি আর সোজাভাবে দাঁড়াতে পারে? কোমর দুমড়ে গিয়েছে, উরু দু'টো শুকিয়ে পায়ের গুলের সমান, আর যাকে পেমা ফুলের কলি বলতো তার অস্তিত্বই নেই।"[২৪] এই আড়াই দশক ধরে পেমা, পাহাড় কেটে কেটে তৈরী করেছে খেত ফলিয়েছে রাই শাক, রসুন, রক্ষা করেছে তার নারীত্ব। কুড়ি বছরের যুবক চাষিকে পঁচিশ বছর পর সে ফিরে পায় দুমড়ানো মোচড়ানো বেঢপ বেপটু 'কাঁকড়ার মতো' একটা রুগ্ন বৃদ্ধ। তাকে শরীর উৎসর্গ করতে গিয়ে ঘৃণায় লজ্জায় শিউরে ওঠে সে। পেমা জানে সেই থেনডুপ কোনোদিন ফিরবে না আর। এ থেনডুপ অবশ শরীরে অশক্ত, বৃদ্ধ হলেও মনে মনে সেও ওই ক্যাসিয়া ফুলের মতো ছটফটে তরুণ।

কিন্তু একসময় অবাক হয়ে পেমা আবিষ্কার করল যে সে হান মেজরের দ্বারা বলপূর্বক ধর্ষণের শিকার, 'শয়তান-উত্তুরে কুত্তা' কথাটা পেমার মনে হলো, শয়তান আর মিথ্যাবাদী, সেই লোকনাথ যে নাকি হয়ত ইংরেজ বাণিজ্য গোয়েন্দা ছিল। তাই বুদ্ধগয়ার জল বলে উত্তেজনা জাগাবার জন্য তার হুস্কির বোতলটা যেমন মিথ্যা তেমনি হানদের সাম্য আর সুন্দর চেহারাটা মিথ্যা। কেন না তাদের প্রথমবারের ফল থেনডুপের শরীরে আর দ্বিতীয় বারেরটা পেমার গর্ভে। সাইমিয়া ক্যাসিয়া গাছের গ্রাফটিং হলে যেমন সোনালী ফুল ফুটে থেনডুপের শরীর বুকেও তেমনি দেশ প্রেমের সোনালী ফুল ফুটেছিল, যাকে সে জীবন দিয়ে ধরে রাখতে চেয়েছে। তাইতো থেনডুপের আদর্শকে বহন করে আশ্রয় দিতে গিয়েই যেন পেমা আত্মহননের পথে গেল না, মিথ্যাবাদীরা, খুনীরা ও সত্য বয়ে আনতে পারে। সে সত্য স্বদেশ-প্রেম। সাইমিয়া ক্যাসিয়া গাছের মত পেমাও যেন এক বৃক্ষ যে জড়িয়ে ধরে আশ্রয় দিতে চেয়েছে থেনডুপকে। তার আদর্শকে গুলির ধাক্কায় বাস্তবের গাছটার মতো পেমার মনের অনেকটা ভেঙে গেলেও তাতে ভাবীকালে কেউ হয়ত গোলাপী ফুলের মধ্যে সোনালী ফুলের একটা স্তবক দেখতে পারে। যে ফুলের মর্মকথা অবিদ্বেষ সাম্য আর স্বদেশ প্রেম। সে ফুল তার আগামী সন্তান, যাকে আশ্রয় দিয়ে আড়াল দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবে পেমা। আসলে শুধু সময় নয়, ইতিহাস নয়, সাম্য বা বিদ্বেষ নয়, দেখা যায় না কেবল উপলব্ধি করা যায় এমন জীবনের রহস্যময় জটিল বৃত্তটিকেই অমিয়ভূষণ উন্মোচিত করতে চেয়েছেন 'সাইমিয়া-ক্যাসিয়া' গল্পের পটভূমিতে।

ফাল্গুনের আগুন যখন হা-হা করে ওঠে তখন মন কোনো নির্দিষ্ট আধারে আকার নিতে চায় না। মনে হয় কোনো আদর্শ, কোনো ভালোবাসার অনুপম প্রলেপ দেহ জড়িয়ে হৃদয় সুস্নিগ্ধ, সুমসুন করে তোলা যায়। অথচ তাই বলে আগের ভালোবাসাটুকুও মিথ্যা যায় না। তাই 'শ্রীলতার দ্বীপ' গল্পের পামলিং মিটার কারখানার ইঞ্জিনিয়ার মালিকের স্ত্রী শ্রীলতা অন্তত জীবন জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়ে টুটুল কোলে আসার পরও কৌতুকরসে 'পাগল পরাণী' হয়ে উঠতে পেরেছিল। ফলে ছোট নৌকায় করে এক নির্জন দ্বীপে যখন মধুমিতার স্বামী অধ্যাপক কমরেড সুব্রত ঘোষের সাথে কবোষ্ণ শীতের রোদে পাশাপাশি শুয়ে থাকতে হয়েছিল তখন তার মন হয়েছিল যে নদীর মত মনের স্রোতের ও একটা 'পয়েন্ট অব নো রিটার্ন' থাকে। আর সেখানে পৌঁছালে স্রোতের হিসাবেই মানতে হয় নিজে থেকে ফেরা যায় না। যার পরিণয় মিটুন। যে কি

না বড় হয়ে অধ্যাপক কিংবা ট্রেড ইউনিয়নের নেতা হবে, কোন বাঁধনই যাকে হয়ত বেঁধে রাখতে পারবে না। 'অন্বেষণ' গল্পে চিফ সেক্রেটারি সেনের মৃত্যুর পর স্ত্রী বিভা সেন বাড়িঘর, চাবির গোছা, দুই ছেলে ফেলে রেখে পথে বেরিয়েছে, প্রায় রহস্য রোমাঞ্চ গল্পের মতোই নিজের অতীতকে মুছে ফেলে পালিয়ে বেড়ানো। এইদিকে বিভার বোন মীরাও অনেকপথ মাড়িয়ে হিমালয়ের বুকে এক ছোট্ট গ্রামে এসে বাসা বেঁধেছে। সেখানে দীর্ঘদিন পরে দুই বোনের মিলন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে এই মিলনে কোনো স্থিতি বা প্রাপ্তির সুর বেজে উঠে নি। বরং থাকে শুধুপথ, অন্তহীন চলা বা অনুসন্ধান। যদিও বিভার মনে হয়েছে- "খোঁজটাই কি সব? আর তারপরে অজয়দের কেতকীদের মৃত্তিকা হয়ে যাওয়া?"[২৫] আর এভাবেই অনন্ত জীবন জিজ্ঞাসায় রহস্যলোকের উন্মোচন ঘটেছে অমিয়ভূষণের গল্পে।

আবার 'ম্যাকডাফ সাহেব ও অন্যান্য গল্প' সংকলনের অধিকাংশ গল্পেই ঘুরে ফিরে উচ্চারিত হয়েছে ধ্রুবপদের মতো এক অনন্ত জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধান। তাই 'ততঃ কিম্'। 'ততঃ কিম্' গল্পের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র মৃগাঙ্ক রায় ঘর সংসার ছেড়ে পাহাড়ে এসে বাস করেছে। সেই সঙ্গে এই প্রতীতিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে যে সংসারের নিরেট দেওয়ালে বন্ধ বাতাসে দম আটকানো পরিবেশে একজন সংসারী মানুষ যেন থেকে জানালা খুলে দেয়। গল্পকার দেখিয়েছেন জীবনে ব্যর্থতা আছে, বঞ্চনা ও অন্তহীন। কিন্তু তবু মানুষ সার্থকতার সন্ধানে চলেছে। সেখানে গৃহত্যাগ সবসময় অপরিহার্য নয়, বরং সংসারের মধ্যে থেকেও নিরন্তর সংগ্রাম শীলতার নিজেকে এক থেকে বহু করা, নিজের শক্তি চৈতন্যকে প্রকাশ করা। ফলে নিজেকে আবিষ্কার করার মধ্যেই ফুটে ওঠে এক সার্থকতার তাৎপর্য। 'বেতাগ, বাইতোড়, সুরসুনা' প্রভৃতি গল্পে দেখি লেখক রাখী ভট্টর আত্মকথনের ভেতরে মূল গল্পটি বুনে সেটিতে সামান্য মন্তব্য সংযোজন করে কাহিনি দাঁড় করিয়েছেন। পূর্ব বাংলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে পালিয়ে আসা কিছু মানুষের ক্ষয়ে যাওয়া জীবন কথা, পাশাপাশি সত্তরের দশকের একদল তরুণের জীবনের আলো ক্ষয়ে যাওয়ার কাহিনি নিয়েই এ গল্প।

এছাড়া 'মামকাঃ' গল্পে ও দেখি জীবনের অনন্ত প্রবাহের মধ্যে ক্ষণিক বেঁচে থাকার এক অমোঘ কাহিনি। কি কেউই তো আর বাঁচতে পারে না। আর পারে না বলেই গল্পে দেখি ব্রজেশ্বরকে সুপর্ণ গুলি করে মেরেছে, কিন্তু তাকেও মরতে হবে। কেন না লেদু মিঞা হয়ে সুপর্ণ বাঁচতে পারে না। তেমনি 'মৃন্ময়ী অপেরা' গল্পের ছিধর অন্ধকার সমুদ্রের গভীরে না নেমে বরং দু'এক ফুট নীচেকার অস্পষ্ট আলোর নীল নীল উঠে আসতে চায়, কেন না সেখানে আছে বেঁচে থাকার মতো প্রচুর উপাদান। যেমন- অক্সিজেন কিংবা অন্ধকার কাটানোর মতো প্রচুর আলো। কিন্তু ছিধর নিজেও জানে এইভাবে বেশি দিন বেঁচে থাকা যায় না, কেন না বেশি দিন থাকলে দম বন্ধ হয়ে যাবে, অর্থাৎ মৃত্যু। আবার 'পায়রার খোপ' গল্পে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কেবল জীবনের সমাপ্তি। প্রথম মেজদাকে মরতে হয়েছে সুবীর-শমুর হাতে। বন্ধু মুকুলকে খুন করেছে সুবীর। এরমধ্যেও সুবি বেঁচে আছে, কিন্তু কী মর্মান্তিক তাঁর বেঁচে থাকা। কেন না খবরের কাগজে সুবি জেনেছে তার বাবা অধ্যাপক নিখিলানন্দ আন্ডারগ্রাউন্ডে ছিলেন। মৃত্যুর আগে স্ত্রী ও ছেলেকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেও দেখতে পাননি। কেন না বাবার মৃত্যুর পর সুবিরা জানতে পারে আসল ব্যাপার। যদিও সুবির মা মৃতা স্বামীকে দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু সুবিকে সরকার শেষকৃত্য করতে, এমনকি শ্রাদ্ধ করতেও ছেড়ে দেয়নি। তাই তো সুবি পালিয়ে যেতে চায় জেল থেকে। কিন্তু কেমন করে পালিয়ে যাবে, কোথায় পাবে সেই সম্ভবনা, যা থেকে সুবি শুরু করতে পারে আর একটি জীবন, যেখানে সূর্য উদিত হয় সমস্ত অন্ধকার, মনিলনতা তার সংশয়ের বেড়া জাল ডিঙ্গিয়ে।

আসলে বাস্তব জীবনে সকলের স্বপ্ন সার্থকতা পায় না, তাই অমিয়ভূষণের গল্পে প্রধান চরিত্ররা বেরিয়ে আসতে চাইলেও বেরিয়ে আসতে পারেনি। কেননা গল্পকার অমিয়ভূষণ পথের ডাক শুনেছেন, কিন্তু পথের শেষ কোথায় তা জানাবার জন্য ব্যগ্র হননি। ফলে ছোট গল্প উদ্বাস্তু দল কিংবা তাঁতী বউ, পেমা, শ্রীলতা, বিভা সেন, এমনকি সুপর্ণ, রাখী ভট্ট, মৃগাঙ্ক, ছিধর, সুবীর সকলের সামনেই ছিল এক অনন্ত জিজ্ঞাসা- পথের শেষ কোথায়? এদিক থেকে তাদের চলা অতীতকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যাওয়া, শুধু চলা আর চলা, চলতে চলতে পিছিয়ে পড়া। শেষ পর্যন্ত কোথাও যে পৌঁছাতেই হবে এমন কোনো ভাবনায় অমিয়ভূষণ পুরোপুরি বিশ্বাসী নন। কিন্তু তিনি জানেন 'স্ট্রাগল' আছে, থাকবে ঘরে এবং বাইরে। আর এই নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চলার আর এক নাম জীবন। অমিয়ভূষণের গল্প তাই বহতা জীবনেরই গল্প। আর এই গল্প চলে এমনভাবে যে এক গল্পের ভিতরেই জন্ম নেয় আর এক গল্প। এইভাবেই গল্প গুলি চলে ধারাবাহিকতার এক অখণ্ড বহমান জীবন প্রবাহের স্রোত ধরে। কেন না অমিয়ভূষণ মনে করেন- "...জীবনকে চিনবার একটা উপায় আছে, সেটা তাকে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়া। এবং তখন দেখা যাবে জীবনটা আসলে হল-ত যা ঠিক তাই, বেশিও নয় কমও নয়। তার কোন স্রষ্টা ও নেই, গন্তব্য ও নেই, উদ্দেশ্য ও নেই, সে কয়েদিও নয়, অনুতপ্ত আত্মসমালোচক রূপে সত্য মিথ্যা বিবৃতির জন্যে নাম স্বাক্ষর করে না"।[২৬]

সূত্র নির্দেশ:

১। ভূদেব চৌধুরী: বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কল, ২০০৩, পৃ-৩০
২। তদেব, পৃ-২০
৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: গল্পগুচ্ছ-১, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কল, ১৪০৩, পৃ-১৯
৪। ভূদের চৌধুরী: প্রাগুক্ত, পৃ-৩১
৫। লাল নক্ষত্র: আশ্বিন- ১৩৯৩, পৃ-১৮৯
৬। বিজ্ঞাপন পর্ব-১০: জানুয়ারি -১৯৮২-৮৩, অমিয়ভূষণের সাক্ষাৎকার -১, পৃ-৯
৭। উত্তরাধিকার: শারদ-১৯৯৪, পৃ-১৫
৮। গল্প মেলা: বার্ষিক সংখ্যা-১৯৯৩, পৃ-২১
৯। অমিয়ভূষণ মজুমদার: লিখনে কী ঘটে, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা: লি: কল, ডিসেম্বর- ১৯৯৬, পৃ-৭৪
১০। এবং মুশায়েরা: অক্টোবর-ডিসেম্বর -১৯৯৯, পৃ-২২
১১। অমিয়ভূষণ মজুমদার: নির্বাস, জানুয়ারি-১৯৯৬, দে'জ পাবলিশিং, কল, পৃ-১
১২। ঐ: শ্রেষ্ঠগল্প, দে'জ পাবলিশিং, কল-১৯৯৪, পৃ-৮০
১৩। ঐ: লিখনে কী ঘটে, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৯
১৪। ঐ: শ্রেষ্ঠগল্প, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৬
১৫। তদেব, পৃ-৩০
১৬। তদেব, পৃ-৩০
১৭। তদেব, পৃ-৩৮

১৮। তদেব, পৃ-৪৫
১৯। তদেব, পৃ-৪৫
২০। তদেব, পৃ-১৩-১৪
২১। তদেব, পৃ-২৭
২২। তদেব, পৃ-২৮-২৯
২৩। তদেব, পৃ-১১৬
২৪। তদেব, পৃ-১২৫-১২৬
২৫। তদেব, পৃ-২০৬
২৬। অমিয়ভূষণ মজুমদার: লিখনে কী ঘটে, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৪